বাঙালী মুসলমানের মন

'শহীদে কারবালা' পুঁথিতে কবি কারবালার যুদ্ধে শহীদ হজরতের দৌহিত্র হজর হোসেনের মস্তকসহ ঘাতক সীমারের দামেস্ক যাত্রা অংশটি রচনা করতে যেয়ে তাঁ কল্পনাশক্তির অবাধ ব্যবহার করেছেন। কবি বিষয়টি এভাবে বর্ণনা করেছেন : কারবা থেকে দামেস্ক যাচ্ছে সীমার, মনে অপার আনন্দ, এখন হজরত হোসেন বিগতজীবন কাঁধের বর্শার অগ্রভাগে শোভা পাচ্ছে তাঁর কর্তিত মস্তক। লক্ষ টাকা পারিতোষিক লা করার পথের যাবতীয় প্রতিবন্ধক অন্তর্হিত। নিশ্চয়ই বাদশাহ্ নামদার এজিদ তাঁ প্রতিশ্রুতি পালন করবেন। যেতে যেতে সন্ধ্যে হলো পথে। সে রাতের জন্য সীমার এক গৃহস্থের বাড়িতে আশ্রয় নিতে হলো। গৃহকর্তার নাম পুঁথিলেখকের জবানী আজর। হিন্দু ধর্মাবলম্বী, তার ওপর আবার ব্রাহ্মণ। সেই রাতে হজরত হোসেনের ছি মস্তক এক অলৌকিক কাজ করে ফেলল। গৃহকর্তা আজর, তাঁর ব্রাহ্মণী, সাতপুত্র এব সাত পুত্রবধূ এক সঙ্গে কাটা মস্তকের মুখে কলেমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেল।

পুঁথি-পুরাণের জগতে এরকম অলৌকিক কাণ্ড প্রায়ই ঘটতে দেখা যায়। ওই জাতী সাহিত্যের বেশির ভাগেরই একটি মুখ্য বৈশিষ্ট্য হলো ধর্মের মহিমা কীর্তন করা সেজন্যে পুঁথি-পুরাণের নায়কদের চরিত্রে সম্ভব-অসম্ভব সব রকমের ক্ষমতা এবং গুণগ্রা আরোপ করাটাই বিধি। এদিক দিয়ে দেখতে গেলে আধুনিক প্রোপাগান্ডা লিটারেচারে সঙ্গে পুঁথিসাহিত্যের একটা সমধর্মিতা আবিষ্কার করা খুব দুরূহ কর্ম নয়। শু পুঁথিসাহিত্যে কেন, 'বৌদ্ধ জাতক' থেকে শুরু করে, 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' এব 'মঙ্গলকাব্য' সমূহেরও উদ্দেশ্য ছিল ঐ একই রকম। ঐ জাতীয় সাহিত্যে সচরাচর অবাস্তব-অলৌকিক কাণ্ড ঘটে থাকে, ঘেঁটে একটা তালিকা সংগ্রহ করলে ছিন্ন মস্তকে মুখে কলেমা পড়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করাটা খুব আশ্চর্য ঠেকবে না। পুঁথি-পুরাণে রচয়িতাদের পাল্লায় পড়ে বনের হিংস্র বাঘ, শিংঅলা হরিণ পর্যন্ত মানুষের ভাষায় কথ বলে, দুঃখে রোদন করে, কাটা মাথা তো কোন্ ছার! সুতরাং ধরে নেয়া ভালো পুঁথি-পুরাণের জগতে জাগতিক নিয়মের পরোয়া না করে লোমহর্ষক ঘটনারাজি একের প

এক অবলীলায় ঘটে যেতে থাকবে। রোমাঞ্চকর হিন্দি ছবির দর্শকের মতো পাঠকের রুদ্ধশ্বাসে দেখে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না; সম্ভব-অসম্ভব, বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্ন তোলা অর্থহীন। যেমন : 'লাখে লাখে সৈন্য চলে কাতারে কাতার/গণিয়া দেখিল মর্দ চল্লিশ হাজার।' এ জাতীয় পংক্তি পাঠ করার পরেও বুদ্ধিমান সিরিয়াস মানুষের মনে কোনো জিজ্ঞাসা-চিহ্ন জাগে না। অর্থাৎ সকলেই ধরে নিয়ে থাকেন, পুঁথি-পুরাণের জগতে এ জাতীয় ঘটনা হামেশা ঘটতেই থাকবে। এ নিয়ে মনকে কষ্ট দেওয়া খামোখা পণ্ডশ্রম। কাণ্ডজ্ঞানকে ফাঁকি দেয় এ জাতীয় এন্তার ঘটনা সম্বন্ধে ওয়াকেবহাল হতে হবে, সে ব্যাপারে আগাগোড়া প্রস্তুতি গ্রহণ করেই পুঁথি-পুরাণের জগতে প্রবেশ করা উত্তম।

এরকম অভিজ্ঞতা বোধ করি অনেকেরই হয়ে থাকে। রাশি রাশি ঘটনার মধ্যে একটি বিশেষ ঘটনার অতি সামান্য খণ্ডাংশ মুহূর্তেই ধাক্কা দিয়ে পাঠককে সচকিত করে তোলে। 'শহীদে কারবালার' বর্ণিত এই ঘটনাটিও সেই জাতীয় একটি। সীমার কারবালা থেকে দামেস্ক যাওয়ার পথে আজর নামধারী জনৈক ব্রাহ্মণের দেখা পেয়েছিল এবং তার বাড়িতে রাতের আতিথ্য গ্রহণ করেছিল। এই অংশটি পাঠ করার পরে মনের ভেতর একটি ঘোরতর অবিশ্বাস মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। এই সাধারণ একান্ত বাস্তব ঘটনাটিকে পাঠকের মনের জারক রস হজম করে নিতে পারে না। মনের তলাতে শিলাখণ্ডের মতো পড়ে থাকে। তিনি যদি তার বদলে ইরাকী, তুরানী, ইহুদী, খ্রিষ্টান, তাতার, তুর্কী, ইত্যাদি যে-কোনো জাতির যে-কোনো ধর্মের মানুষের সঙ্গে সীমারের সাক্ষাৎ ঘটিয়ে দিতেন, তাহলে পাঠকের মনে কোনো প্রশ্নই জাগত না। তিনি কারবালা থেকে দামেস্ক যাওয়ার পথে ধু-ধু মরুপ্রান্তরে বাঙলা দেশের ব্রাহ্মণকে আমদানী করলেন কোত্থেকে? একজন ব্রাহ্মণ কারবালা দামেস্কের মাঝপথে দারা-পুত্র-পরিবার নিয়ে কাটা মস্তকের কাছে কলেমা পড়ে ইসলাম গ্রহণ করার জন্য বসবাস করছিল, এইখানে মন ভয়ঙ্কর রকম বেঁকে বসে। শুধু 'শহীদে কারবালা' নয়, 'জঙ্গনামা' পুঁথিটার ওপর দৃষ্টি বুলোলেও এই রকম অজস্র ঘটনার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। 'জঙ্গনামা'তে পুঁথিলেখক হজরত আলীকে দিয়ে কাফের ও বেদীনদের ওপর এমন চোটপাট চালিয়েছেন যে গদার আঘাতে থেতলানো, তলোয়ারের ঘায়ে কাটা পড়া কিংবা শেষ পর্যন্ত পবিত্র ধর্ম ইসলামের শরণ গ্রহণ না করা পর্যন্ত কারো রক্ষা নেই। আমীর হামজার শৌর্যবীর্য অবলম্বন করে যে পুঁথি রচিত হয়েছে তা পড়লে লোম দাঁড়িয়ে যাওয়ার মতো অনেক চমৎকার সংবাদ পাওয়া যায়। প্রায়শ দেখানো হয়েছে, মহাবীর হামজা এমন শক্তিশালী যে তিনি দেশ-দেশান্তর ঘুরে ঘুরে কাফেরদের সদলবলে পরাস্ত করছেন আর তাঁদের ঘরের সুন্দরী নারীদের পাণিপীড়ন করে চলেছেন তো চলেছেনই। কাফের এবং হিন্দু পুঁথিলেখকের কাছে অনেকটা সমার্থক। অনেক সময় কাফের বলতে হিন্দু এবং হিন্দু বলতে কাফের ধরে নিয়েছেন। সে যা হোক, আমীর হামজা এমন মস্ত বড় বীর যে তিনি দৈত্যের দেশ কো-কাফে গমন করে অপার শৌর্য বলে দৈত্যদের দমন করে বীর বিক্রমে ফিরে এসেছেন। হযরত আলীর কল্পিত পুত্র মুহম্মদ হানিফার বীরত্বগাঁথা বর্ণনা করে সোনাভান, জৈগুনবিবি ইত্যাদি যেসব পুঁথি লেখা হয়েছে বিষয়-বৈচিত্র্যের দিক দিয়ে সেগুলো আরও মজার। সে সকল পুঁথিতে দেখা যায় যে, মুহম্মদ হানিফা 'দুলদুল' ঘোড়ায় দুইধারী তলোয়ার ঘুরিয়ে দেশ থেকে দেশে নব অশ্বমেধযজ্ঞ করে বেড়াচ্ছেন। পথে যেসব রাজ্য পড়ছে সবগুলো নারীশাসিত। এই নারীদের সকলেই সুন্দরী; সৎ ব্রাহ্মণ-কন্যা। অবিবাহিতা এবং প্রচণ্ড রকমের বীরাঙ্গনা। আর সকলের এমন এক ধনুকভাঙা পণ যে, বাহুবলে যে পুরুষ হারাতে পারবে তাকে ছাড়া অন্য কারো কাছে বিয়ে বসতে মোটেই রাজী নন। মুহম্মদ হানিফা সংবাদ শুনে হাওয়ার বেগে সে দেশে দেখা দিচ্ছেন, রণংদেহি হুংকার তুলছেন। বীরাঙ্গনা ব্রাহ্মণ-কন্যাদের বাহুবলে পরাস্ত করে ইসলাম ধর্ম কবুল করিয়ে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করছেন। ব্যাপারটি এতই পৌনঃপুনিকভাবে ঘটেছে যে মুহম্মদ হানিফাকে মনে হবে ঊনবিংশ শতাব্দীর একজন কুলীন হিন্দু-সন্তান, বিয়ে করে বেড়ানোই তাঁর একমাত্র পেশা। মুহম্মদ হানিফা মস্ত বীর হলে কি হবে, অধিক সংখ্যক রূপসী স্ত্রীর সঙ্গে রতি-রণ এবং ময়দান-রণ দুই-ই একসঙ্গে করতে হলে মাঝে মাঝে এই সমস্ত ভয়ংকরী বীরাঙ্গনাদের হাতেও নাকাল হতে হয়। সেকালে বীরাঙ্গনাদের পরাজিত করতে পারলে স্বামী আর পরাজিত হলে থাকতে হত দাস হয়ে। সুতরাং হানিফারও দুর্দশার অন্ত থাকে না। সংবাদ যায় হজরত আলীর কাছে। বীর পুত্রের এসব কীর্তিকলাপ তিনি বিলক্ষণ সমর্থন করেন; আর হৃদয়ে অপত্যস্নেহও প্রচুর। হায়দরী হাঁক হেঁকে রণ-দামামা বাজিয়ে পুত্রের সাহায্যার্থে ছুটে আসেন। পুত্রকে শিখিয়ে পড়িয়ে একেবারে লায়েক করে সেই সমস্ত বিক্রমশালী রমণীদের হার মানতে বাধ্য করান। তারপরে যুদ্ধকার্য সাঙ্গ হলে পিতা-পুত্র দুজনে একই সঙ্গে দুটো বিবাহ করেন। পিতা যান দেশে ফিরে আর পুত্রবর প্রেমতৃষ্ণায় মাতাল হয়ে মরুভূমির ডনজুয়ানের মতো নতুন নারী-রত্নের সন্ধানে দেশে দেশে সফর করেন।

ইসলামের প্রাথমিক যুগের বীর এবং সাধু পুরুষদের নিয়ে যে সমস্ত পুঁথিপত্র লেখা হয়েছে তাতে তাঁদের ত্যাগ, ধর্মনিষ্ঠা ইত্যাদির সঙ্গে সঙ্গে এ জাতীয় বিস্তর আদি রসাত্মক ব্যাপার-স্যাপার স্থান লাভ করেছে। যে সকল ঐতিহাসিক চরিত্র পুঁথিলেখকরা তাঁদের বিষয়ের উপজীব্য করেছেন, তাতে করে চরিত্রের ঐতিহাসিক সত্য সম্পূর্ণভাবে খেলাপ করে নিজেদের মনের রঙে রাঙিয়ে একেবারে জবুথবু করে হাজির করেছেন। কল্পিত চরিত্র হলে তো কথাই নেই, আগাগোড়া রঙ চড়িয়ে রঙিলা না করে ছাড়েননি। তা করতে যেয়ে পুঁথিলেখকেরা পরিবেশ, সমাজ এবং সামাজিক সংঘাত, মূল্যচেতনা দুই হাতেই দেদার ব্যবহার করেছেন।

যেমন ধরা যাক, কারবালা থেকে দামেস্কে যাওয়ার পথে কোনো ব্রাহ্মণের বসবাসের বিষয়টি। তা তো একরকম জানা কথাই যে কোনো ব্রাহ্মণের সেখানে নিবাস থাকা সম্ভব নয়। কিন্তু তাহলে কি হবে, পুঁথিলেখকের সেটি জানা থাকা চাই তো। কারবালা-দামেস্কের মাঝপথে নয়, গোটা আরবদেশে ব্রাহ্মণ না থাকুক তাতে পুঁথিলেখকের কি আসে যায়! এই বাংলাদেশে তো ব্রাহ্মণ আছে! আর আমাদের

পুঁথিলেখক ভদ্রলোকটি তো বাঙালী এবং তিনি ব্রাহ্মণ জাতটার ওপর হাড়ে হাড়ে চটা। সুতরাং অনায়াসে ব্রাহ্মণকে কারবালা-দামেস্কের মাঝপথে বসিয়ে স্ত্রী-পুত্রসহ সপরিবারে তাঁকে দিয়ে কলেমা পড়িয়ে মানসিক ঘৃণার মানসিক প্রতিশোধ নেয়া যায় এবং নিয়েছেনও।

ইতিহাসে হজরত আলীকে কম বিচক্ষণ বলার যথেষ্ট অবকাশ আছে। কিন্তু তিনি মানুষ হিসেবে উদার মনের অধিকারী ছিলেন এবং তাঁর চরিত্র এমন নির্মল সুন্দর ছিল যে এখনো পর্যন্ত তাঁর গুণগ্রাম সর্বসাধারণের অনুকরণীয় বলে বিবেচনা করা হয়। পুঁথিলেখক তাঁকে শক্তিমন্ত এবং বীর দেখাতে যেয়ে পশুশক্তিতে বলীয়ান হৃদকম্প সৃষ্টিকারী একজন প্রায় নারীলোলুপ মানুষের চিত্র অঙ্কন করেছেন।

হজরত হামজা মদীনাতে ওহোদের যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন এবং হিন্দা নাম্নী জনৈকা কোরেশ রমণী যে তাঁর রক্তাক্ত হৃদপিণ্ড চিবিয়ে খেয়েছিল একথা সর্বজনবিদিত। তিনি জীবনে মক্কা-মদীনার বাইরে কোথাও গিয়েছিলেন কিনা সন্দেহ। পুঁথিলেখক তাঁকে শতাধিক বছর পরমায়ু দান করেছেন, কমপক্ষে অর্ধশত পত্নীর স্বামী, সে অনুপাতে পুত্র- পৌত্রাদি উপহার দিয়েছেন। আমির হামজা হাজার খানেক যুদ্ধে বিজয়ী বীর, দেশ-দেশান্তরে তাঁর তো অবারিত গতায়ত, এমনকি দৈত্যের দেশ কো-কাফে যেয়েও অসমসাহসিক কাজ সমাধা করে এসেছেন। এতেও পুঁথিলেখক তৎকালীন সমাজের প্রচলিত সংস্কার এবং শিল্পরুচির ব্যবহার করেছেন। হিন্দু সমাজের বীরেরা যদি পাতাল বিজয় করে বহাল তবিয়তে ফিরে আসতে পারেন, আমির হামজা দৈত্যের দেশে গমন করে তাদের শায়েস্তা করে আসতে পারবেন না কেন? ঐতিহাসিক চরিত্র হিসেবে মুহম্মদ হানিফার মূল কাণ্ড কিছু নেই বলেই তো সুবিধে। কল্পনা যেভাবে ইচ্ছে বিচরণ করতে পেরেছে। হিন্দুদের দেবতা শ্রীকৃষ্ণ যদি বৃন্দাবনে ষোল শত গোপবালা নিয়ে লীলা করতে পারেন, মুহম্মদ হানিফার কি এতোই দুর্বল হওয়া উচিত যে মাত্র এ কয়টা ব্রাহ্মণ কন্যাকে সামলাতে পারবেন না!

২

এই ধরনের দো-ভাষী পুঁথিসমূহের বিষয়বস্তুর প্রতি দৃষ্টিপাত করলে কতিপয় বৈশিষ্ট্য পাঠকের চোখে পড়বেই। সেগুলোর মধ্যে অত্যন্ত প্রণিধানযোগ্য কয়েকটি হলো : প্রথমত ধর্মের মাহাত্ম্য বর্ণনা করার জন্যই এই সকল কাহিনী লেখকেরা বিবৃত করতে প্রবৃত্ত হয়েছেন। নায়কের অসাধারণ শৌর্যবীর্য এবং অসমসাহসী ক্রিয়াকলাপের অন্তরালে সত্যধর্মের বিজয়ই স্ফুরিত হচ্ছে, এটা স্বদেশবাসীর কাছে স্বদেশী ভাষায় প্রকাশ করাই বেশিরভাগ লেখকের মনোগত অভিপ্রায়। মহাভারতের বাংলা অনুবাদক যেমন বলেছেন : 'মহাভারতের কথা অমৃত সমান/কাশীরাম-দাস কহে শুনে পুণ্যবান।' তাঁর অনুকরণ করে পুঁথিলেখকও পাঠক এবং শ্রোতাদের কাছে লোভনীয় আবেদন

রেখেছেন। একটা দৃষ্টান্ত : 'অধীন ফকির কহে কেতাবের বাত/যেবা শুনে বাড়ে তার বারেক হায়াত।' এ জাতীয় হৃদয়-মনে উচ্চাকাঙ্ক্ষা সৃষ্টিকারী আশাব্যঞ্জক পংক্তিমালা পুঁথিগুলোর পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় ছড়িয়ে রয়েছে। সুতরাং বিশ্বাস করতে দ্বিধা থাকা উচিত নয় যে মানুষের মনে ধর্মবোধ জাগ্রত করা এবং ইসলাম ধর্মাশ্রিত মানুষের হাতে যে সাংসারিক সম্পদ, সুন্দরী নারী আপনাআপনি এসে পড়ে এবং পরকালে অনন্ত সুখভোগের লীলাস্থল বেহেশত তাঁদের জন্য অবধারিত, আর শত্রুদের ওপর তাঁদের বিজয় অর্জন সে তো এক রকম স্বাভাবিকই — এ সকল বিষয় প্রমাণ করাই ছিল পুঁথিলেখকদের অধিকাংশের মনের প্রাথমিক অভিপ্রায়। দ্বিতীয়ত, এই পুঁথিসমূহের প্রতি তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টি ফেললে একটা জিনিশ বারবার চোখে পড়তে থাকে। যে সময়ে ওগুলো রচিত হয়েছিল, সে সময়কার মুখ্য-গৌণ বিবদমান, বর্ধিষ্ণু-ক্ষয়িষ্ণু যে সকল সামাজিক ধারা, ধারাসমূহের মধ্যবর্তী দ্বন্দ্ব-সংঘাত কোথাও প্রচ্ছন্নভাবে, আবার কোথাও সুস্পষ্টভাবে পুঁথিসাহিত্যে ছাপ ফেলেছে। পুরনো সমাজের গর্ভ থেকে তুর্কী আক্রমণের ফলে আরেকটি নতুন সমাজ জন্মলাভ করেছে এবং সমাজের জনগণের একাংশের মধ্যে নতুন চলমানতার সঞ্চার হয়েছে, সেই নতুনভাবে চলমানতা অর্জনকারী জনগোষ্ঠীর মধ্যে নতুন আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি বিকাশ করার উদ্দেশ্যেই পুঁথিলেখকেরা রচনায় মনোনিবেশ করেছেন। তার ফলে তাদের মনেও নতুন এক ধরনের জনপ্রিয় বীরশ্রেণী জন্মলাভ করতে আরম্ভ করে। পুরনো সমাজের যে সকল নায়ক, খলনায়ক — রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ, সীতা, রাবণ, ভীম, অর্জুন, হনুমান, কর্ণ, ভীষ্ম, দ্রোণ, শ্রীকৃষ্ণ, রাধিকা, দ্রৌপদী ইত্যাদির কাহিনীতে ধর্মীয় এবং সামাজিক কারণে মুসলমান সমাজ মনোনিবেশ করতে রাজী ছিল না। এই নূতন সমাজের নিজস্ব নায়ক চাই, চাই নিজস্ব বীর। যাঁদের জীবনকথা আলোচনা করে দুঃখে সান্ত্বনা, বিপদে ভরসা পাওয়া যায়, যাঁরা তাদের আপনজন হবেন এবং একটি আদর্শায়িত উন্নত জীবনের বোধ সৃষ্টি করতে পারবেন। এই সকল কারণের দরুণ হযরত মুহম্মদ, হজরত আলী, বিবি ফাতেমা, হাসান-হোসেন, বীর হানিফা, আমির হামজা, হাতেমতাই, রুস্তম ইত্যাদি চরিত্র বাংলা সাহিত্যে নবজন্ম লাভ করে। তাঁদের জন্ম-প্রক্রিয়ার মধ্যে দুটি মুখ্য বিষয় মিলিমিশ খেয়েছে। এই ঐতিহাসিক মহামানবদের যে সকল কীর্তি-কাহিনী লোকশ্রুতি-জনশ্রুতির আকারে তাঁদের কাছে এসে পৌঁছেছে (পুঁথিলেখকদের অধিকাংশই আরবী ফার্সী ভাষা জানতেন না এবং ইসলামী শাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন না) তার সঙ্গে মহামানব এবং সামাজিক নায়কদের সম্পর্কে প্রচলিত যে ধারণা তৎকালীন সমাজে বলবৎ ছিল তার সংশ্লেষ ঘটেছে। তাই ইসলামের দিকপালদের নিয়ে রচিত পুঁথিসাহিত্যে যেমন চরিত্রের ঐতিহাসিকতাকে পাওয়া যাবে না, তেমনি বাঙালী সমাজের প্রচলিত বীরদের সম্বন্ধে যে ছকবাঁধা ধারণা বর্তমান ছিল তাও পুরোপুরি উঠে আসেনি। দুটি মিলে একটি তৃতীয় বস্তুর সৃষ্টি হয়েছে। আসলে পুঁথি সাহিত্য হলো দুটি পাশাপাশি সমাজব্যবস্থা এবং

সামাজিক আদর্শের ঘাত-প্রতিঘাতে মুসলমান জনগণ যেভাবে সাড়া দিয়েছে তারই প্রতিফলন। মুসলমান জনগণের মতো হিন্দু জনগণও আরেক রকমভাবে এই সামাজিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় সাড়া দিয়েছেন, মঙ্গলকাব্যসমূহ এবং বৈষ্ণব সাহিত্যে ঘটেছে তার প্রকাশ।

এই নবসৃষ্ট সাহিত্যকর্ম সমূহের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হলো, তাতে নূতন সামাজিক চাহিদার জবাব রয়েছে। জনগণ যে ধরনের রসালো কাহিনী শুনতে আগ্রহী সে ধরনের কাহিনীই লেখকেরা পরিবেশন করেছেন। মুসলমান এবং হিন্দু সাহিত্যস্রষ্টারা আপনাপন সমাজের দিকে লক্ষ্য রেখেই সৃষ্টিকর্মে মনোনিবেশ করেছেন। মুসলমানদের তুলনায় হিন্দু কবিদের অনেকগুলো সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক সুযোগ বিদ্যমান ছিল। প্রথমত আক্রমণমুখী বর্ধিষ্ণু মুসলমান সমাজের সঙ্গে সংঘাতে হিন্দু সমাজের তলা পর্যন্ত কেঁপে উঠেছিল। আত্মরক্ষার প্রয়োজনটাই ছিল তাঁদের কাছে বড় কথা। হিন্দু কবিরা এই সামাজিক ভীতির সঙ্গে একাত্মবোধ না করে পারেননি। আত্মরক্ষার প্রয়োজনে যখনই কোনো নতুন সামাজিক পরিবর্তন এবং নবতর মূল্যচেতনা সমাজের অভ্যন্তর থেকে সূচিত হয়েছে, তার প্রাণবস্তুটি সাহিত্য-স্রষ্টাদের কণ্ঠে আপনা থেকেই কথা কয়ে উঠেছে। আর মুসলমান শাসনামলে হিন্দু সমাজের যে সামাজিক রূপান্তর ঘটছিল তাতে সংস্কৃতিগত ব্যবধান ছিল না, নিজেদের সংস্কৃতিকে নিজেদের প্রয়োজনে নতুনভাবে রূপদান করছিলেন। যেখানে বিষয় এবং বিষয়ীর সঙ্গে কোনো দূরত্ব বা বিরোধ নেই। সমাজের পূর্বার্জিত সামাজিক অভিজ্ঞতাসমূহকে পূর্ণবিশ্বাসে আত্ম-প্রত্যয়ের সঙ্গে কাজে লাগাতে পেরেছিলেন। মুসলমান পুঁথিলেখকদের তুলনায় হিন্দু কবিদের রচিত সাহিত্যকর্মে যে অধিক মানসিক পরিশ্রুতি, পঠনপারিপাট্য এবং কাণ্ডজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়, তার কারণ তাঁদের সম্পূর্ণ অজানা একটি বিষয়ের প্রতি ধাবিত হতে হয়নি।

তুলনামূলক বিচারে মুসলমান পুঁথিলেখকদের হাতে সে পরিমাণ সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক সুযোগ-সুবিধে ছিল না। প্রথমত তাঁদেরকে সম্পূর্ণ অজানা একটি বিষয়কে প্রকাশ করতে হয়েছিল। ইসলাম ধর্মের আসল স্বরূপ, তার দার্শনিক প্রতীতি ইত্যাদি সম্বন্ধে মুসলমানদের আরবী-ফার্সীতে লেখা গ্রন্থসমূহের বদলে লোকশ্রুতি এবং দূরকল্পনার ওপর নির্ভর করতে হয়েছে। একথাও সত্য যে পুঁথিলেখকদের অধিকাংশেরই আরবী-ফার্সী সম্বন্ধে কোনো জ্ঞান ছিল না। তাছাড়া হিন্দুদের দেব-দেবী এবং কাব্যোক্ত নায়ক-নায়িকাদের প্রতি মনে মনে একটি বিদ্বেষের দূরস্মৃতিও সক্রিয় ছিল। কেননা এই দেব-দেবীর পূজারীদের অত্যাচার এবং ঘৃণা থেকে অব্যাহতি পাবার আশায় তাঁদের পূর্বপুরুষেরা প্রথমে বৌদ্ধ ধর্ম এবং পরে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তাই মুসলমান পুঁথিলেখকেরা তাঁদের রচনায় যখনই সুযোগ পেয়েছেন, এই দেব-দেবীর প্রতি তাচ্ছিল্য এবং ঘৃণা প্রকাশ করতে কুণ্ঠাবোধ করেননি। কিন্তু তা সত্ত্বেও হিন্দু সমাজের দেব-দেবী, নায়ক-নায়িকার প্রভাব থেকে তাঁদের মন মুক্ত হতে পারেনি। তাই তাঁরা সচেতনভাবে

এই দেব-দেবীদের প্রতিস্পর্ধী নায়ক এবং চরিত্র যখন খাড়া করেছেন, এই সৃষ্ট চরিত্র সমূহের মধ্যেই দেব-দেবী নতুনভাবে প্রাণ পেয়েছে। হজরত মুহম্মদ, হজরত আলী, আমির হামজা, মুহম্মদ হানিফা, বিবি ফাতেমা, জৈগুন বিবি এই চরিত্রসমূহ বিশ্বাসে এবং আচরণে, স্বভাবে-চরিত্রে যতদূর আরব দেশীয়, তার চাইতে বেশি এদেশীয়। তাঁদের মধ্যে যে বুদ্ধিমত্তা এবং হৃদয়াবেগ কাব্যলেখক চাপিয়ে দিয়েছেন তা একান্তভাবেই বঙ্গদেশে প্রচলিত দেব-দেবীর অনুরূপ। বাইরের দিক থেকে দেখলে হয়তো অতোটা মনে হবে না। কিন্তু গভীরে দৃষ্টিক্ষেপ করলে তা ধরা না পড়ে যায় না। বিশ্বাস এবং অভিজ্ঞতা সাহিত্যের দুই মুখ্য উপাদান। বিশ্বাস অভিজ্ঞতার নবরূপায়ণে সাহায্য করে। আলোকিত বিশ্বাস আলোকিত রূপায়ণ ঘটায় এবং অন্ধবিশ্বাস অন্ধ রূপায়ণ। মুসলমান পুঁথিলেখকদের বিশ্বাসের যে শক্তি তা অনেকটা অন্ধবিশ্বাস, কেননা ইসলামী জীবনবোধসমৃদ্ধ বিমূর্ত কোনো ধারণা তাঁদের ছিল না। তাই তাঁদের শিল্পকর্ম অতটা অকেলাসিত। প্রতি পদে কল্পনা হোঁচট খেয়েছে বলে তাঁদের রচনার শক্তি নেই। আলাওল, দৌলত উজীর প্রমুখ মুসলমান কবি উৎকৃষ্ট কাব্যরচনা করতে পেরেছেন। তার কারণ তাঁদের কতিপয় সুযোগ ছিল। আলাওল নিজে আরবী, ফার্সী এবং সংস্কৃত সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন। কাব্যের স্বাভাবিকতা-অস্বাভাবিকতা সম্বন্ধে তাঁর পরিপূর্ণ বোধ ছিল। তদুপরি তিনি রাজসভায় বসে কাব্য রচনা করেছিলেন। রাজসভায় যে রুচি-চর্চা এবং জীবনাদর্শের আলোচনা চলতে পারে, জনসভাতে তা চলে না। একই কথা দৌলত উজীর সম্বন্ধেও কম-বেশি প্রযোজ্য।

কিন্তু যে সকল মুসলমান কবিকে জনগণের ধর্মবোধ পরিতৃপ্ত এবং রসপিপাসা মিটাবার জন্য কলম ধরতে হয়েছিল, সেখানে কবি কী বলতে চান, কাদের জন্য বলতে চান এবং যা বলছেন তা অনুধাবনযোগ্য হচ্ছে কিনা এইসব বিবেচনার বিষয় ছিল।

৩

মুসলমান সমাজের কোন্ অংশের সামাজিক চাহিদা পূরণ করার জন্য এই পুঁথিসমূহ লেখা হয়েছিল এবং কারা লিখেছিলেন, তাঁদের বিদ্যাবত্তা এবং সাংস্কৃতিক অগ্রগতি কতদূর ছিল— তলিয়ে বিচার করলে কতিপয় বিষয় স্পষ্টভাবে ধরা পড়বে। মূলত বাঙালী সমাজের যে শ্রেণীটি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন এবং নতুন ধর্ম গ্রহণ করার কারণে, অধিকতর খোলসা করে বলতে গেলে মুসলিম রাজশক্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দরুণ, তাঁদের মধ্যে নতুন আকাঙ্ক্ষার উন্মেষ ঘটেছিল, সেই শ্রেণীটিতেই ছিল পুঁথিসাহিত্যের আদর সীমাবদ্ধ। তাঁরাই এর লেখক, পাঠক এবং সমঝদার। তাছাড়া রোসাং ইত্যাদি রাজদরবারে বাংলা ভাষা এবং সাহিত্যের যে চর্চা হয়েছে, তাতে যে সকল মুসলিম কবি-সাহিত্যিক আশাতিরিক্ত সাফল্য প্রদর্শন করেছেন, জনগণের দৈনন্দিন জীবনধারার সঙ্গে তার সংযোগ খুব নিবিড় কিংবা গভীর ছিল না। রাজসভার

বিদ্যাবত্তা, মার্জিত রুচি, বিলাসবহুল জীবনযাত্রার ধরনই অধিকাংশ ক্ষেত্রে আলাওল প্রমুখ শক্তিমন্ত কবির কাব্য-ভাবনাকে নিয়ন্ত্রণ করেছিল। আর কবিরাও ছিলেন বহুদর্শী পণ্ডিত। আরবী, ফার্সী এবং সংস্কৃতি ভাষাতে ছিলেন সমান পারদর্শী। তাঁদের সাধনার মধ্যে কাব্যের ঔচিত্যবোধ জখম হয়নি বটে, কিন্তু জনগণের জীবনধারার সমতলে এসে চাহিদামতো কাব্যরচনাও তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। জনগণের সঙ্গে অনেকটা সম্পর্কহীন জ্যোৎস্নাভুক সৌন্দর্যবিলাসী ছিলেন বলেই তাঁদেরকে কাব্যের সামাজিক আদর্শ নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামাতে হয়নি। আরবী-ফার্সী থেকে যে কোনো কাহিনী অনুবাদ করে রসসমৃদ্ধ ভাষায় প্রকাশ করতে পারলেই তাঁদের দায়িত্ব শেষ হয়ে যেত এবং তাঁদের সে যোগ্যতায় ঘাটতি ছিল না।

দো-ভাষী পুঁথিলেখকদের সমস্যা ছিল ভিন্নরকম। তাঁরা ছিলেন একই সঙ্গে জনগণের শিল্পী এবং শিক্ষক। পুঁথিসমূহের অনেকগুলো রচনার পেছনে সক্রিয় ছিল সামাজিক প্রয়োজন। এই প্রয়োজন পূর্ণভাবে পালন করার জন্য তিনটি উপাদান অপরিহার্যভাবে প্রয়োজনীয় ছিল। যে সামাজিক আদর্শটি তাঁরা প্রচার করতে যাচ্ছিলেন সে সম্বন্ধে সম্যক ধারণা এবং উপলব্ধি। যে সমাজে এই আদর্শ প্রচার করেছিলেন সেই বিশেষ সমাজটির লোক-সাধারণের সাংস্কৃতিক চেতনার মান; বিমূর্তভাবে নতুন সামাজিক আদর্শ ধারণ করার মতো মানসিক সাবালকত্ব অর্জন করেছে কিনা সে সম্বন্ধে একটা প্রাক-ধারণা এবং পূর্বের শিল্পাদর্শের অগ্রসর ধারাটির বিষয়ে তাঁদের উপযুক্ত জ্ঞান আর সেই ধারাটিকে সামাজিক প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে সম্পূর্ণ নতুন একটি খাতে প্রবাহিত করার ক্ষমতা ছিল কিনা। এই তিনটি মৌল বিষয়ের কোনোটিই পর্যাপ্ত পরিমাণে পুঁথিলেখকদের সপক্ষে ছিল না। সামাজিক বীর এবং নায়ক সৃষ্টির মাধ্যমে ইসলাম ধর্মের মহিমা কীর্তন করার উদ্দেশ্যেই তাঁদের বেশিরভাগ কাব্যসাধনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। কিন্তু ইসলাম সম্বন্ধে তাঁদের জ্ঞান কিছু লোকশ্রুতি, জনশ্রুতি, আউলিয়া দরবেশদের অলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ড ইত্যাদির মধ্যেই সীমিত ছিল। আরবী-ফার্সী ভাষায় দখলের অভাবে অধিকাংশেরই মনে ইসলাম বলতে একটা পাঁচমিশেলী ঝাপসা ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল এবং তাঁদের রচিত সাহিত্যে সেই ধারণারই অভিব্যক্তি ঘটেছে। তাছাড়া যে সমাজের লোক-সাধারণের কাছে নতুন ধর্মের সারল্য এবং সৌন্দর্য ব্যাখ্যা করছিলেন, সেই সমাজটির মানসিক পরিসর অত্যন্ত সংকীর্ণ এবং সঙ্কুচিত ছিল। কেননা নিম্নবর্ণের অধিকাংশ হিন্দুই যুগ যুগ ধরে আর্থিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে নিপীড়িত হওয়ার ফলে মুক্তির আশায় প্রথমে বৌদ্ধ এবং পরে ইসলাম ধর্ম কবুল করেন। নতুন ধর্ম গ্রহণ ছিল একটি নির্যাতিত মানবগোষ্ঠীর আত্মরক্ষার অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত একটা ব্যবহারিক পদক্ষেপ। সুতরাং পূর্ববর্তী সমাজেও যে গরীয়ান একটা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ছিল, তাঁরা তার মর্মমধু পান করা থেকেও বঞ্চিত ছিলেন। আবার ইসলামী সমাজ এবং সংস্কৃতির যে একটা উন্নত উদার আদর্শ ছিল ঐতিহাসিক কারণে তাও তাঁরা অধিগত করতে পারেননি। এই অনগ্রসর জনসমাজ ইসলামের নামে যে সকল কাহিনী চাইতেন,

সেই রকম কাহিনীই তাঁদের শোনাতে হত। আর পুঁথিলেখকরা ছিলেন এই জনগণেরই কণ্ঠ।

এই সকল কারণে বাঙালী মুসলমান রচিত পুঁথিসাহিত্যে উদ্ভট রসের অতি বেশি ছড়াছড়ি। হিন্দু মহাকাব্য এবং পুরাণসমূহের বীর-বীরাঙ্গনাদের চরিত্রের অপভ্রংশ মুসলিম কবিদের সৃষ্ট বীরদের মধ্যে নতুন করে জীবনলাভ করেছে। তাই পুঁথিসাহিত্যে অগ্রসরমানতার চাইতে প্রতিক্রিয়ার জের অধিক। মনের হীনম্মন্যতাবোধ থেকেই এই প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি। এর পেছনে একগুচ্ছ ঐতিহাসিক কারণ বর্তমান। মুসলমান পুঁথিলেখকেরা সচেতনভাবে এক সামাজিক আদর্শ, একটি শিল্পাদর্শের বদলে আরেকটি শিল্পাদর্শ নির্মাণের প্রয়াস গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু নতুন শিল্পাদর্শটির চেহারা কিরকম হবে, জীবনের কোন্ মূল্যচেতনার বাহন হবে, অতীতের কতদূর গ্রহণ করবে, কতদূর বর্জন করবে, সে সম্বন্ধে তাঁদের মনে কোনো পরিচ্ছন্ন ধারণা ছিল না। তাই তাঁরা অনেক সময়ে বহিরঙ্গের দিক দিয়ে নতুন সৃষ্টি করলেও, আসলে তা ছিল গলিত অতীতের রকমফের। উপলব্ধির বদলে বিক্ষোভ, পরিচ্ছন্ন চিন্তার বদলে ভাবাবেগই তাঁদের শিল্পদৃষ্টিকে কুয়াশাচ্ছন্ন করে রেখেছে। এক সময়ে এই মুসলমানের পূর্বপুরুষেরা যে উঁচু বর্ণের হিন্দুদের দ্বারা নির্যাতিত হয়েছিলেন, এই অপমানজনক দুরস্মৃতি বাইবেলের 'অরিজিনাল সীন' বা আদি পাপের ধারণার মতো তাঁদের মনে নিরন্তর জাগরুক থেকেছে। মুসলমান রচিত পুঁথি-সাহিত্যের প্রতিক্রিয়াশীলতা আসলে সামাজিক প্রতিক্রিয়াশীলতারই সাহিত্যিক রূপায়ণ। সে বিষয়ে কোনো স্পষ্ট ধারণা পোষণ করতে হলে এই অপমানজনক দুরস্মৃতির বিষয়টি স্মরণে রাখার প্রয়োজন আছে। মুসলিম শাসনের অবসানের পর এই সামাজিক প্রতিক্রিয়া আরো গভীর এবং অন্তর্মুখী রূপ পরিগ্রহ করে। এই প্রতিক্রিয়ার জের বাঙালী মুসলমান সমাজে এত সুদূরপ্রসারী হয়েছে যে উনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম শক্তিশালী গদ্য-লেখক মীর মশাররফ হোসেনের সুবিখ্যাত 'বিষাদ সিন্ধু' গ্রন্থটিতেও 'শহীদে কারবালা' পুঁথির ব্রাহ্মণ আজরকে একই চেহারায়, একই পোশাকে, একই স্থানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। সময়ের পালাবদলের ব্যাপারটি এই অত্যন্ত শক্তিধর লেখকের মনে সামান্যতম আঁচড়ও কাটতে পারেনি। পুঁথিলেখকের কাণ্ডজ্ঞানহীনতাকে তিনিও বরণ করে নিয়েছেন।

৪

যেহেতু নবদীক্ষিত মুসলমানদের বেশিরভাগই ছিলেন নিম্নবর্ণের হিন্দু, তাই আর্য সংস্কৃতিরও যে একটা বিশ্বদৃষ্টি এবং জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে যে একটা প্রসারিত বোধ ছিল, বর্ণাশ্রম ধর্মের কড়াকড়ির দরুণ ইসলাম কিংবা বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষা গ্রহণের পূর্বে সে সম্বন্ধেও তাঁদের মনে কোনো ধারণা জন্মাতে পারেনি। পাশাপাশি ইসলামও যে একটা উন্নততর দীপ্ত ধারার সভ্যতা এবং মহীয়ান সংস্কৃতির বাহন হিসেবে মধ্যপ্রাচ্যে একটা সামাজিক বিপ্লব সংসাধন করেছিল, বাঙালী মুসলমানের মনে তার কোনো গভীরাশ্রয়ী

প্রভাবও পড়েনি বললেই চলে। প্রথমত, ভারতে ইসলাম প্রচারে মধ্যপ্রাচ্যের সুফী দরবেশদের একটা গৌণ ভূমিকা ছিল বটে, কিন্তু লোদী , খিলজী এবং চেঙ্গিস খানের বংশধরদের সাম্রাজ্য বিস্তারই ইসলাম ধর্মের প্রসারের যে মুখ্য কারণ, তাতে কোনো সংশয় নেই। এই পাঠান-মোগলদের ইসলাম এবং আরবদের ইসলাম ঠিক একবস্তু ছিল না। আব্বাসীয় খলীফাদের আমলে বাগদাদে, ফাতেমীয় খলীফাদের আমলে উত্তর আফ্রিকায় এবং উমাইয়া খলীফাদের স্পেনে যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা হয়েছিল, ভারতবর্ষে তা কোনদিন প্রবেশাধিকার লাভ করেনি। মুসলমান বিজ্ঞানী এবং দার্শনিকদের যে অপ্রতিহত প্রভাব ইউরোপীয় রেনেসাঁকে সম্ভাবিত করে তুলেছিল, ভারতের মাটিতে সে যুক্তিবাদী জ্ঞানচর্চা একেবারেই শিকড় বিস্তার করতে পারেনি। খাওয়া-দাওয়া, সংগীতকলা, স্থাপত্যশিল্প, উদ্যান রচনা এবং ইরান, তুর্কীস্থান ইত্যাদি দেশের শাসনপদ্ধতি এবং দরবারী আদব-কায়দা ছাড়া অন্য কিছু ভারতবর্ষ গ্রহণ করেনি।

তদুপরি, এই ভারতবর্ষের লক্ষ্ণৌ, দিল্লী ইত্যাদি অঞ্চলে ইসলামের যেটুকু ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ হয়েছে, বাঙলা মুলুকে তার ছিটেফোঁটাও পৌছাতে পারেনি। যে মুসলিম শাসকশ্রেণীটি নানা সময়ে বাঙলা দেশ শাসন করতেন, তাঁরা সকলেই ছিলেন বিদেশী। রক্ত এবং ভাষাগত দিক দিয়ে স্থানীয় জনগণের সঙ্গে তাঁদের কোনো সম্পর্ক ছিল না। অনেকটা ইউরোপীয় শাসকদের মতো সামাজিক বিচ্ছিন্নতার মধ্যেই তাঁরা বসবাস করতেন এবং নতুন পোশাক-আশাক, ফ্যাশান ইত্যাদির জন্যে দিল্লী কিংবা ইরানের দিকে সাগ্রহে তাকিয়ে থাকতেন। এই উঁচুকোটির মুসলিম শাসকবর্গ যাঁদের হাতে অধিকাংশ শাসনতান্ত্রিক দায়িত্ব অর্পিত ছিল, তাঁরা স্থানীয় জনগণের স্বাভাবিক নেতা ছিলেন না। এই উঁচুকোটির মুসলমান প্রশাসকেরা এদেশীয় যে শ্রেণীটির সহায়তায় বাঙলা দেশের শাসনকার্য পরিচালনা করতেন, তাঁরা প্রায় সকলেই ছিলেন স্থানীয় উঁচু বর্ণের বাঙালী ব্রাহ্মণ, কায়স্থ কিংবা বৈদ্য শ্রেণীর লোক। যখনই প্রয়োজন পড়েছে কিংবা ব্রাহ্মণ শ্রেণীর আনুগত্য সম্বন্ধে মনে সন্দেহ জেগেছে তাঁরা অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তর থেকে খেলাত এবং পদবী বিতরণ করে আরেকটি নেতৃশ্রেণী সৃষ্টি করেছেন। 'খাসনবীস', 'মহলানবীস', 'দেওয়ান', 'রায়রায়ান', 'বখসী', 'মুন্সী' 'দস্তিদার' ইত্যাদি পদবীতেই তার প্রমাণ মেলে। বাঙলার স্থানীয় মুসলমানেরা কদাচিৎ বিদেশী মুসলমান শাসকদের সঙ্গে শাসনতান্ত্রিক কর্মে সহায়তা করার সুযোগ লাভ করেছেন। তার কারণ ছিল, একটি রাজশক্তির সঙ্গে সহায়তা করার জন্য যে পরিমাণ নিরাপদ আর্থিক ভিত্তির প্রয়োজন বাঙালী মুসলমানদের তা ছিল না। মুসলিম রাজশক্তি এই দেশের সমাজ-কাঠামোর মধ্যে অতি সামান্যই রূপান্তর এনেছিল। তাঁরা অনেকটা নির্বিবাদেই পূর্বতন সমাজ-কাঠামোকে গ্রহণ করেছিলেন। পরিবর্তন ততটুকুই করেছিলেন, যতটুকু তাঁদের প্রয়োজন। অর্থাৎ পূর্বেকার শাসক নেতৃশ্রেণীর শূন্যস্থানটি তাঁরা পূর্ণ করেছিলেন। মুসলিম শাসনের পূর্বে যে সমাজ ব্যবস্থাটি চালু ছিল, পরেও সেই একই ব্যবস্থা চালু থেকেছে। তার মধ্যে কোনো মৌলিক রূপান্তর বা পরিবর্তন তাঁরা আনতে পারেননি।

তাই নতুন ধর্ম গ্রহণ করার পরেও স্থানীয় মুসলমানরা ইংরেজ আমলের দিশী খ্রিস্টানদের মতো একটা উন্মত্ত গর্ববোধ ছাড়া ইসলামী কিংবা আর্য সংস্কৃতির কিছুই লাভ করতে পারেননি। তাই খতিয়ে দেখলে দেখা যাবে, মুসলমান আমলেও যাঁরা শাসনতান্ত্রিক প্রয়োজনে ফার্সী ভাষা শিক্ষা করেছেন, তাঁদের বেশিরভাগই ছিলেন বাঙালী হিন্দু সম্প্রদায়ের উঁচু বর্ণের লোক। বাঙালী মুসলমানদের অবস্থার, পেশার এবং রুচির বিশেষ পরিবর্তন হয়নি। ইসলাম গ্রহণের ফলে তাঁরা কতিপয় মোটা অভ্যাস বর্জন করে কতিপয় মোটা অভ্যাসকে গ্রহণ করেছিলেন। যেহেতু সংখ্যাগত দিক দিয়ে তাঁরা ছিলেন অনেক, উৎপাদন পদ্ধতির সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত ছিলেন এবং রাজশক্তি সময়ে-অসময়ে তাঁদের প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শন করতেন, এই সকল কারণের দরুণ তাঁদের মধ্যে দ্রুত একটা সামাজিক আকাঙ্ক্ষা জন্মলাভ করেছিল। পুঁথিসাহিত্যের মধ্যে এই আকাঙ্ক্ষাই পূর্ণ দৈর্ঘ্যে মুক্তিলাভ করেছে।

৫

এই পুঁথিসমূহের দো-ভাষী অর্থাৎ বাংলা এবং আরবী-ফার্সী মিশ্রিত হওয়ার পেছনে একটি অত্যন্ত দূরবর্তী ঐতিহাসিক কারণ বর্তমান। হাদীসে তিনটি কারণে অন্যান্য ভাষার চাইতে আরবীকে অগ্রাধিকার দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। প্রথম হলো কোরআনের ভাষা আরবী, দ্বিতীয় কারণ বেহেশতের অধিবাসীদের ভাষা আরবী এবং তৃতীয়ত হজরত মুহম্মদ নিজে একজন আরবীভাষী ছিলেন। এই তিনটি মুখ্য কারণে যে সমস্ত দেশে ইসলাম প্রচারিত হয়েছে, সেখানে অপ্রতিরোধ্যভাবে এই ভাষাটিরও অনুপ্রবেশ ঘটেছে। আরব অধিকারের পূর্বে মিশর এবং আফ্রিকার দেশসমূহের নিজস্ব ভাষা এবং বর্ণমালা দুই-ই ছিল। কিন্তু আরবদের অধিকারে আসার পর আরবী ভাষা এবং আরবী বর্ণমালা দুটিকেই অধিবাসীদের গ্রহণ করতে হয়। ইসলামের প্রাথমিক যুগে আরবী ভাষা এবং ইসলাম অনেকটা অভিন্নার্থক ছিল। আরবী ভাষাকে গ্রহণ না করে ইসলাম গ্রহণ করলে প্রকৃত মুসলমান হওয়া যাবে না, সে সময়ে এ রকম একটা প্রবল মত অতিমাত্রায় সক্রিয় ছিল। অন্য যে-কোনো সেমিটিক ধর্মের মতো ইসলামেও পারলৌকিক জীবনের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। সারাজীবন মুসলমান হিসেবে জীবন কাটিয়ে পরকালে বেহেশতে যেয়েও ভাষাজ্ঞানের অভাবে একঘরে জীবন কাটাতে হবে এটা ধর্মপ্রাণ মুসলমান মাত্রেরই সহ্যের অতীত একটা ব্যাপার। তাই মিশর থেকে শুরু করে মরক্কো পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলের অধিবাসীরা আরবী ভাষা এবং বর্ণমালা দুটিই গ্রহণ করেছিলেন।

মিশরে যেভাবে সহজে আরবী ভাষা জনগণের কাছে গ্রহণীয় হয়ে উঠতে পেরেছে, ইরানে তেমনটি হতে পারেনি। কারণ ইরানীরা ছিলেন অতিমাত্রায় ঐতিহ্য-সচেতন এবং সংস্কৃতিগত-প্রাণ জাতি। তাঁদের মহীয়ান সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য থেকে এ যুক্তি উদ্ধার করতে বিশেষ বেগ পেতে হয়নি যে আরবী ভাষা না আয়ত্ব করেও প্রকৃত মুসলমান

হওয়া যায়। কোরানের প্রকৃত শিক্ষা তাঁদের নিজস্ব ভাষায় বিকশিত করে তোলার মতো ভাষাগত সমৃদ্ধি এবং মনীষা দুই-ই তাঁদের ছিল। আরবী ভাষাকে গ্রহণ-বর্জন প্রশ্নে ইরানী সমাজ যে একটি চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছিল, কবি ফেরদৌসী, দার্শনিক ইমাম গাজ্জালী প্রমুখ তা গ্রহণ করেছিলেন। ইরানীরা আরবী ভাষা গ্রহণ করেননি, কিন্তু আরবী বর্ণমালা তাঁদেরকে মেনে নিতে হয়েছে। তারপরে ইরান থেকে শুরু করে আফগানিস্তান পেরিয়ে ভারতবর্ষ অবধি মুসলিম শক্তির যে জয়যাত্রা সূচিত হয়েছে তার পেছন পেছন ফার্সী ভাষাও ভারতে প্রবেশ করেছে। এমনকি মোগল বিজেতারা তাঁদের মাতৃভাষা তুর্কীর পরিবর্তে ফার্সীকেই সরকারী ভাষা হিসেবে মেনে নিয়েছেন। মিশরে আরবী যেমন, আফগানিস্থান ইত্যাদি দেশে ফার্সী যেমন চাপিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়েছে, ভারতবর্ষে সেভাবে অনেকদিন রাজভাষা থাকার পরও ফার্সীকে চাপিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়নি। ভারতের হিন্দুরা বড় আশ্চর্য জাত; তাঁরা দরবারে চাকরী করার জন্য উত্তমরূপে ফার্সীভাষা শিক্ষা করেছেন, 'দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো' উচ্চারণ করেছেন, কিন্তু নিজেদের ভাষা বাদ দিয়ে কখনো ঐ ভাষাটিকে গ্রহণ করেননি। সুতরাং ভারতে ফার্সী ছিল জনগণের দৈনন্দিনতার স্পর্শলেশবর্জিত দরবারবিহারী একটি অভিজাত শ্রেণীর ভাষা। স্থানীয় মুসলিম জনগণের মধ্যেও তার বিশেষ প্রসার ঘটেনি। স্বাতন্ত্র্যগর্বী মুসলমানেরা নিজেদের প্রয়োজনে ফার্সী বর্ণমালাকে গ্রহণ করে ভারতীয় ভাষাসমূহের সমন্বয়ে উর্দু নামে একটি পাঁচমিশেলী ভাষা তৈরি করেছেন। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা যেমন রেনেসাঁর যুগে জাতীয় ভাষাসমূহের পূর্ণাঙ্গ বিকাশের পূর্বে ল্যাটিন ভাষাতে সন্দর্ভ ইত্যাদি রচনা করতেন, তেমনি মুসলমান ধর্মবেত্তারা ধর্মগ্রন্থসমূহের টীকা-টিপ্পনী ফার্সী ভাষাতেই রচনা করতেন। সৈয়দ আহমদের আলীগড় আন্দোলনের পর উর্দু ভাষাতে নতুন প্রাণ সঞ্চারিত হয় এবং ঐ ভাষাতেই ধর্মীয় সন্দর্ভসমূহ লেখা হতে থাকে।

বাঙালী মুসলমানের চোখে ফার্সী এবং উর্দু ভাষা দুটো আরবীর মতোই পবিত্র ছিল। আর এ দুটো রাজভাষা এবং শাসক নেতৃশ্রেণীর ভাষা হওয়ায়, তাদের শ্রদ্ধা নিশ্চয়ই অনেকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। কিন্তু এ দুটির একটিকেও পরিপূর্ণভাবে রপ্ত করার জন্য একটি সমাজের পেছনে যে শক্ত আর্থিক ভিত্তি এবং সাংস্কৃতিক বুনিয়াদ থাকা প্রয়োজন ছিল দুটির কোনোটিই তাঁদের ছিল না। কলকাতার পার্ক স্ট্রীট এলাকার এ্যাংলো ইণ্ডিয়ানরা যে ধরনের ইংরেজি বলেন কিংবা ঢাকার কুট্টি অধিবাসীরা যে উর্দু বলেন ততটুকু ভাষাজ্ঞান অর্জন করাও সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক কারণে তাঁদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। কেননা এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে ইংরেজ এবং ইংরেজী ভাষার আর ঢাকার কুট্টিদের সঙ্গে উর্দু এবং নবাবদের সামাজিক মেলামেশার যে সুযোগ ছিল, বাঙলার আপামর জনগণের সঙ্গে উর্দু-ফার্সী জানা শাসক নেতৃশ্রেণীর ততটুকুও সামাজিক মেলামেশার সুযোগ ছিল না। কিন্তু বাঙালী মুসলমানেরা নিজেদের সামর্থ্য অনুসারে আরবী, ফার্সী এবং উর্দু এই তিনটি ভাষায় তালিম গ্রহণ করার প্রাণান্তকর প্রয়াস চালিয়ে গেছেন। আরবী, ফার্সী এবং উর্দু ভাষাটাও যখন তাঁদের পক্ষে পরিপূর্ণভাবে রপ্ত করা

অসম্ভব মনে হয়েছে তখন ঐ বর্ণমালাতে বাংলা লেখার চেষ্টা করেছেন। এখানে একটা কথা পরিষ্কার করে নেয়ার আছে, কোনো ব্যক্তি বিশেষ একটা ভাষা রপ্ত করতে পারেন, কিন্তু সেটাকে সামাজিকভাবে রপ্ত করা বলা চলে না। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকেও আরবী হরফে বাংলা পুঁথিপত্র যে লেখা হয়েছে সেটাকে ক'জন অবসরভোগী পুঁথিলেখকের নিছক খেয়াল মনে করলে ভুল করা হবে। আসলে তা ছিল বেহেশতের ভাষার প্রতি কৃতজ্ঞতা নিবেদনের অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ। যখন দেখা গেল আরবী হরফে বাংলা লিখেও সমাজে চালু করা যায় না তখন পুঁথিলেখকেরা সবান্ধবে পরবর্তী পন্থাটা অনুসরণ করতে থাকলেন। বাংলা ভাষার সঙ্গে এন্তার আরবী-ফার্সী শব্দ মিশেল দিয়ে কাব্য রচনা করতে আরম্ভ করলেন। জনগণ তাঁদের এই ভাষাটিকে গ্রহণও করেছিলেন। কিন্তু কোন্ জনগণ? এঁরা ছিলেন সেই জনগণ, সংস্কৃত ভাষা যাঁদের জন্য নিষিদ্ধ ছিল, আরবী অজানা, ফার্সীর নাম শুনেছেন এবং উর্দু ভাষা কানে শুনেছেন মাত্র।

সুযোগ পেলে তাঁরা আরবীতে লিখতেন, নইলে ফার্সীতে, নিদেন পক্ষে উর্দুতে। কিন্তু যখন দেখা গেল এর একটাও সামাজিকভাবে ব্যবহার করা সম্ভব নয় তখন বাধ্য হয়েই বাংলা লিখতে এসেছেন। কেউ কেউ সন্দীপের আবদুল হাকিমের সেই 'যেসব বঙ্গেতে জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী/সেসব কাহার জন্ম নির্ণএ ন জানি' পংক্তিগুলো আউড়ে বলে থাকেন যে নিজেদের ভাষার প্রতি পুঁথিলেখকদের অপরিসীম দরদ ছিল। কথাটা সম্পূর্ণ সত্য নয়। আবদুল হাকিমের এই উক্তির মধ্যে একটা প্রচণ্ড ক্ষোভ এবং মর্মবেদনা লক্ষ্য করা যায়। নিশ্চয়ই সে সময়ে এমন লোক ছিলেন যাঁরা সত্যি সত্যি বাংলা ভাষাকে ঘৃণা করতেন। আবদুল হাকিম নিজে সে শ্রেণীভুক্ত নন, তাই সে উঁচু ভাষাতে তাঁর অধিকারও নেই। তাই তিনি তাঁর একমাত্র আদি এবং অকৃত্রিম ভাষাতেই লিখতে প্রবৃত্ত হয়েছেন।

দূর অতীতের কথা বলে লাভ নেই। ফরিদপুরের নবাব আবদুল লতিফও মুসলমান সমাজের শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে উর্দু ভাষার সুপারিশ করেছিলেন। আবুল কাশেম ফজলুল হক যিনি ছিলেন বাংলার প্রথম আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন রাজনীতিবিদ, তিনিও বাড়িতে উর্দু ভাষায় কথাবার্তা বলতেন। ঢাকার কুট্টি অধিবাসীদের অনেকেই অনেকদিন পর্যন্ত রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সক্রিয় বিরোধিতা করেছেন। এই সমস্ত কিছুর মধ্যে থেকে একটি সত্যই স্পষ্টভাবে বেরিয়ে আসে, তা হলো বাঙালী মুসলমানদের অধিকাংশেরই মধ্যে আরবী, ফার্সী, উর্দু ইত্যাদি ভাষার প্রতি একটা অন্ধ অনুরাগ অনেক দিন পর্যন্ত বিরাজমান ছিল।

৬

পলাশীর যুদ্ধের পর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী অনুসৃত নীতির ফলে যে উঁচুকোটির মুসলিম শাসক নেতৃশ্রেণীটি ছিল তার অবস্থা একেবারে শোচনীয় হয়ে পড়ে। ভাষাগত দিক দিয়ে

তাঁরা বাঙালী মুসলমান জনগণের সঙ্গে কোনরকমে সম্পর্কিত ছিলেন না। এ দেশে অনেকটা বিদেশীর মতোই অবস্থান করতেন। সরকারী চাকুরীই ছিল তাঁদের এই দেশে অবস্থান করার মুখ্য অবলম্বন। নবাবী আমলের অবসানের পর যখন ইংরেজ শাসন কায়েম হলো তাঁরা না পারলেন ইংরেজদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে, না পারলেন নিজেদের ধর্মীয় জনগণের নেতৃত্বদান করতে। রক্তগত, ভাষাগত, রুচি, সংস্কৃতি এবং আচরণগত ব্যবধানের দরুণ আপদকালে সমাজের নেতৃশ্রেণীর পালনীয় যে ভূমিকা রয়েছে, বাঙলা দেশে অবস্থানকারী অভিজাত মুসলিম শ্রেণীটির তা পালন করার কথা একবারও মনে আসেনি।

কিন্তু উত্তর ভারতে হয়েছে সম্পূর্ণ উল্টো। সেখানেও মুসলিম শাসক নেতৃশ্রেণীটি মোগল শাসনের অবসানের পরে একেবারে নিঃস্ব হয়ে পড়েছিলেন। অত্যল্পকাল গত না হতেই স্যার সৈয়দ আহমদের নেতৃত্বে তাঁরা নতুন ব্যবস্থাকে মেনে নেয়ার জন্য এবং নতুন ব্যবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়াবার জন্য মনন এবং মানসিকতার পরিবর্তনে লেগে যান। তার ফলশ্রুতি আলীগড় কলেজ। এই কলেজের সবচেয়ে প্রণিধানযোগ্য যে অবদান তা হলো মুসলিম নেতৃশ্রেণীকে পুঞ্জীভূত হতাশা থেকে উদ্ধার করে ব্রিটিশমুখী করা। ব্রিটিশ শাসকদেরও সিপাহী যুদ্ধের সংশয়-সন্দেহের কুজ্ঝটিকা সরিয়ে মুসলিমমুখী করে তোলার ব্যাপারে, ব্যক্তিগতভাবে স্যার সৈয়দ আহমদ নিজে, তাঁর বন্ধু এবং অনুরাগীবর্গ ও প্রতিষ্ঠিত আলীগড় কলেজ বিরাট ভূমিকা পালন করেছে। তাই সেখানে মুসলমানেরা সংখ্যালঘিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও লেখাপড়া, ব্যবসা-বাণিজ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের চাইতে অপেক্ষাকৃত অগ্রসর ছিলেন। আসলে স্যার সৈয়দ আহমদ মুসলমানদের ব্রিটিশ শাসকদের কাছ থেকে সুযোগ নেয়ার পদ্ধতিটা ভালোভাবে শিখিয়েছিলেন। তাঁর চিন্তা সারা ভারতের শিক্ষিত মুসলমানদের মধ্যে এত বেশি শেকড় বিস্তার করেছিল যে আলীগড়-শিক্ষিত মুসলমানেরা কদাচিৎ সুযোগসন্ধানী নীতি পরিহার করতে পেরেছিলেন; কেননা জনগণ এবং অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে ভাষাগত, সংস্কৃতিগত, রুচি ও আচারগত শ্রেণীদূরত্ব ছাড়া অন্য কোনো দূরত্ব ছিল না। কিন্তু বাঙলা দেশে ব্যাপারটি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্নরকম। ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অভিজাত শ্রেণী একেবারে তলিয়ে গেল। কিন্তু তাদের আচার-আচরণ, সামাজিক আদর্শ অটুট থেকে গেল। হিন্দু সমাজের প্রতিযোগিতা এড়িয়ে ব্রিটিশ শাসকদের কৃপাকণা সম্বল করে যে সকল মুসলমান ওপরের দিকে উঠে আসতেন, মৃত মুসলিম অভিজাতদের আদর্শকেই তাঁদের নিজেদের আদর্শ বলে বরণ করে নিতেন। এঁরা আবার অনেক সময় আপন মাতৃভূমি এবং মাতৃভাষার জন্য স্যার সৈয়দ আহমদ যা করেছেন বাঙলা দেশের মুসলমানদের জন্য একই কাজ করা উচিত মনে করতেন।

প্রায়শ হালের একগুঁয়ে ইতিহাস-ব্যাখ্যাকারদের মধ্যে একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। তাঁরা বলে থাকেন, ব্রিটিশ শাসনের আমলে বাঙলার মুসলমান সমাজ অধঃপতনের গভীর পঙ্কে নিমজ্জিত হয়ে পড়ে। এটা পুরো সত্য তো নয়ই, সিকি পরিমাণ সত্যও এর

মধ্যে আছে কিনা সন্দেহ। সত্য বটে, মুসলিম শাসনের অবসানের পর শাসক নেতৃশ্রেণীটির দুর্দশার অন্ত ছিল না। কিন্তু তাদের সঙ্গে সাধারণ বাঙালী মুসলমান জনগণের একমাত্র ধর্ম ছাড়া অন্য কোনো যোগসূত্র ছিল কি? আর মুসলমান জনগণের অবস্থা ইংরেজ শাসনের পূর্বে অধিকতর ভালো ছিল কি? নবাবী আমলেও এ দেশীয় ফার্সী জানা যে সকল কর্মচারী নিয়োগ করা হত, তাঁদের মধ্যে স্থানীয় হিন্দু কত জন ছিলেন এবং কত জন ছিলেন স্থানীয় মুসলমান, এ সকল বিষয় বিচার করে দেখেন না বলেই অতি সহজে অপবাদের বোঝাটি ইংরেজদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে তাঁরা দায়িত্বমুক্ত মনে করেন।

উত্তর ভারতেও মুসলিম শাসক নেতৃশ্রেণী একইভাবে সর্বস্বান্ত হয়ে পড়েছিলেন, অধিকন্তু তাঁদের অনেকেই সিপাহী বিপ্লবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তার পরেও তাঁরা কী করে এগিয়ে আসতে পারেন এবং তাঁদের মধ্যে কেন সৃষ্টি হলো স্যার সৈয়দ আহমদের মতো একজন মানুষ? বাঙলা দেশের মুসলমানদের মধ্যে তেমন একজন মানুষ জন্মালেন না কেন? এই সকল বিষয়ের সদুত্তর সন্ধান করলেই বাঙালী মুসলমানের যে মৌলিক সমস্যা তার মূলে যাওয়া যাবে।

বাঙালী মুসলমান কারা? এক কথায় এর উত্তর বোধ করি এভাবে দেয়া যায় : যাঁরা বাঙালী এবং একই সঙ্গে মুসলমান — তাঁরাই বাঙালী মুসলমান। এঁদের ছাড়াও সুদূর অতীত থেকেই এই বাঙলা দেশের অধিবাসী অনেক মুসলমান ছিলেন — যাঁরা ঐতিহ্য, সাংস্কৃতিক এবং নৃতাত্ত্বিক ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যানুসারে ঠিক বাঙালী ছিলেন না। আর্থিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক সুযোগ-সুবিধাগুলো তাঁদের হাতে ছিল বলেই বাঙালী মুসলমানের সঙ্গে কৃষ্টি-সংস্কৃতিগত ভেদরেখাসমূহ অনেকদিন পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছিলেন। শুধু তাই নয়, এই প্রভুত্বশীল অংশের রুচি, জীবনদৃষ্টি, মনন এবং চিন্তন-পদ্ধতি অনেকদিন পর্যন্ত বাঙালী মুসলমানের দৃষ্টিকেও আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। বাঙালী মুসলমানের যে ক্ষুদ্রতম অংশ কোনো ফাঁক-ফোকর দিয়ে গলে যখন সামাজিক প্রভুত্ব এবং প্রতাপের অধিকারী হতেন, তখনই বাঙালী মুসলমানের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক চুকে যেত এবং উঁচু শ্রেণীর অভ্যাস, রুচি, জীবনদৃষ্টির এমনকি ভ্রমাত্মক প্রবণতাসমূহও কর্ষণে-ঘর্ষণে নিজেদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অঙ্গীভূত করে নিতেন।

মূলত বাঙালী মুসলমানেরা ইতিহাসের আদি থেকেই নির্যাতিত একটি মানবগোষ্ঠী। এই অঞ্চলে আর্য প্রভাব বিস্তৃত হওয়ার পরে সেই যে বর্ণাশ্রম প্রথা প্রবর্তিত হলো, এঁদের হতে হয়েছিল তার অসহায় শিকার। যদিও তাঁরা ছিলেন সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ, তথাপি সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত প্রণয়নের প্রশ্নে তাঁদের কোনো মতামত বা বক্তব্য ছিল না। একটি সুদীর্ঘ ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বাঙলা মৃত্তিকার সাক্ষাৎ সন্তানদের এই সামাজিক অনুশাসন মেনে নিতে হয়েছিল। যেমন কল্পনা করা হয়, অত সহজে এই বাংলাদেশে আর্য প্রভাব বিস্তৃত হতে পারেনি। বাঙলার

আদিম কৌম সমাজের মানুষেরা যে সর্বপ্রকারে ওই বিদেশী উন্নততর শক্তিকে বাধা দিয়েছিলেন — ছড়াতে, খেলার বোলে অজস্র প্রমাণ ছড়ানো রয়েছে। এই অঞ্চলের মানুষদের বাগে আনতে অহংপুষ্ট আর্য শক্তিকেও যে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে, তাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। জার্মান সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক্স ওয়েবার তাঁর বিশ্ববিশ্রুত 'ভারতের ধর্মসমূহ' গ্রন্থে একটি চমৎকার মন্তব্য করেছেন। আর্য অথবা ব্রাহ্মণ্য শক্তি যে সকল জনগোষ্ঠীকে পদদলিত করে এদেশে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছে, তাঁদেরকে একেবারে চিরতরে জন্ম-জন্মান্তরের দাস বলে চিহ্নিত করেছে। আর যে সকল শক্তি ওই আর্য শক্তিকে পরাস্ত করে ভারতে শাসনক্ষমতার অধিকারী হয়েছেন, তাঁদের সকলকেই মর্যদার আসন দিতে কোনো প্রকারের দ্বিধা বা কুণ্ঠা বোধ করেনি। শক, হুন, মোগল, পাঠান, ইংরেজ যাঁরাই এসেছেন এদেশে তাঁদের সহায়তা করতে পেছপা হয়নি। কিন্তু নিজেরা বাহুবলে যাঁদের পরাজিত করেছিল, তাঁরাও যে মানুষ একথা স্বীকার করার প্রয়োজনীয়তা খুব অল্পই অনুভব করেছে। তবু ভারতবর্ষে এমনকি এই বাঙলা দেশেও যে, কোনো কোনো নীচু শ্রেণীর লোক নানা বৃত্তি এবং পেশাকে অবলম্বন করে ধীরে ধীরে ওপরের শ্রেণীতে উঠে আসতে পেরেছেন তা অন্যত্র আলোচনার বিষয়।

বাঙলা দেশের এই পরাজিত জনগোষ্ঠী যাঁদেরকে রাজশক্তি পাশবিক শক্তির সাহায্যে অন্ত্যজ করে রেখেছিল, তাঁদেরই সকলে এক সময়ে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করে সে প্রাথমিক পরাজয়ের কথঞ্চিৎ প্রতিশোধ গ্রহণ করেছিলেন। শঙ্করাচার্যের আবির্ভাবের ফলে প্রাচীন আর্যধর্মের নবজীবন প্রাপ্তির পর বৌদ্ধদের এদেশে ধনপ্রাণ নিয়ে বেঁচে থাকা যখন অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল, তার অব্যবহিত পরেই এ দেশে মুসলমান রাজশক্তির প্রতিষ্ঠা হয় এবং ভীত-সন্ত্রস্ত বৌদ্ধরা দলে-দলে ইসলাম ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করে। হিন্দু বর্ণাশ্রম প্রথাই এদেশের সাম্প্রদায়িকতার আদিমতম উৎস। কেউ কেউ অবশ্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকেই সাম্প্রদায়িকতার জনয়িতা মনে করেন। তাঁরা ভারতীয় ইতিহাসের অতীতকে শুধুমাত্র ব্রিটিশ শাসনের দুশো বছরের মধ্যে সীমিত রাখেন বলেই এই ভুলটা করে থাকেন।

৭

বাঙালী মুসলমানেরা শুরু থেকেই তাঁদের আর্থিক-সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক দুর্দশার হাত থেকে আত্মরক্ষার তাগিদেই ক্রমাগত ধর্ম পরিবর্তন করে আসছিলেন। কিন্তু ধর্ম পরিবর্তনের কারণে তাঁদের মধ্যে একটা সামাজিক প্রভুত্ব অর্জনের উন্মেষ হলেও জাগতিক দুর্দশার অবসান ঘটেনি। বাঙলা দেশে নতুন নতুন রাজশক্তি প্রতিষ্ঠা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নতুন ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা আশাতীত হারে বৃদ্ধিলাভ করেছে। যেহেতু মৌলিক উৎপাদন পদ্ধতির মধ্যে কোনো পরিবর্তন বা রূপান্তর ঘটেনি, তাই রাজশক্তিকেও পুরনো সমাজ-সংগঠনকে মেনে নিতে হয়েছে। সে জন্যেই মুসলিম শাসনামলেও বাঙালী

মুসলমানেরা রাজনৈতিক, আর্থিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে নিগৃহীত ছিলেন। ইংরেজ আমলে উঁচু শ্রেণীর মুসলমানরা সম্পূর্ণভাবে সামাজিক নেতৃত্বের আসন থেকে বিতাড়িত হলে উঁচু বর্ণের হিন্দুরা স্বাভাবিকভাবেই সে আসন পূরণ করেন।

বাঙালী মুসলমানদের অধিকাংশই বাংলার আদিম কৃষিভিত্তিক কৌম সমাজের লোক। তাঁদের মানসিকতার মধ্যে আদিম সমাজের চিন্তন পদ্ধতির লক্ষণসমূহ সুপ্রকট। বারবার ধর্ম পরিবর্তন করার পরেও বাইরের দিক ছাড়া তাঁদের বিশ্বাস এবং মানসিকতার মৌলবস্তুর মধ্যে কোনো পরিবর্তন আসেনি। দিনের পর দিন গিয়েছে, নতুন ভাবাদর্শ এদেশে তরঙ্গ তুলেছে, নতুন রাজশক্তি এদেশে নতুন শাসনপদ্ধতি চালু করেছে, কিন্তু তাঁরা মনের দিক দিয়ে অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদের মতোই বারবার বিচ্ছিন্ন থেকে গিয়েছেন। মুসলমান সম্প্রদায়ের বেশিরভাগই ছিলেন বাঙালী মুসলমান এবং মুসলমান রাজত্বের সময়ে তাঁদেরই মানসে যে একটি বলবন্ত সামাজিক আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয়েছিল তাঁদেরই রচিত পুঁথিসাহিত্যসমূহের মধ্যে তার প্রমাণ মেলে। কাব্যসাহিত্যের নন্দনতাত্ত্বিক বিচার অনুসারে হয়তো এ সকল পুঁথির বিশেষ মূল্য নেই, কিন্তু বাঙালী মুসলমান সমাজের নৃতাত্ত্বিক এবং সমাজতাত্ত্বিক গবেষণায় এসবের মূল্য যে অপরিসীম সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না।

ইতালীয় দার্শনিক বেনেদিত্তো ক্রোচের মতে প্রতিটি জাতির এমন কতিপয় সামাজিক আবেগ আছে যার মধ্যে জাতিগত বৈশিষ্ট্যসমূহ নির্যাসের আকারে পুরোমাত্রায় বিরাজমান থাকে। রাজনৈতিক পরাধীনতার সময়ে সে আবেগ সাপের মতো কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমিয়ে থাকে এবং কোনো রাজনৈতিক এবং সামাজিক মুক্তির দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হলে সে আবেগই ফণা মেলে হুঙ্কার দিয়ে ওঠে। সাহিত্যেই প্রথমে এই জাতিগত আকাঙ্ক্ষার রূপায়ণ ঘটতে থাকে। জাতিগত আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে যুক্ত হতে না পারলে কোনো মহৎ সাহিত্য যে সৃষ্টি হতে পারে না, একথা বলাই বাহুল্য।

পুঁথিসাহিত্যের মধ্যেও আমরা দেখতে পাই, বাঙালী আদিম কৃষিভিত্তিক কৌম-সমাজের মনটি রাজশক্তির আনুকূল্য অনুভব করে হুঙ্কার দিয়ে ফণা মেলে জেগে উঠেছে। কিন্তু ঐ জেগে ওঠাই সার, সে মন কোনো পরিণতির দিকে ধাবিত হতে পারেনি। প্রতিবন্ধকতাসমূহ সামাজিক সংগঠনের মধ্যেই বিরাজমান ছিল। সমাজ-সংগঠন ভেঙ্গে ফেলে নবরূপায়ণ তাঁরা ঘটাতে পারেননি। কারণ মুসলিম শাসকেরাও স্থানীয় জনগণের মধ্যে থেকে যে নেতৃশ্রেণী সংগ্রহ করেছিলেন, তাদের মধ্যে বাঙালী মুসলমানের প্রতিনিধিত্ব একেবারে ছিল না বললেই চলে। অন্যদিকে ভাষাগত, সংস্কৃতিগত, রুচি এবং আচারগত দূরত্বের দরুণ শাসকশ্রেণীর অভ্যাস, মনন রপ্ত করতে গিয়ে বারবার ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে বাঙালী মুসলমান।

ইংরেজ শাসন কায়েম হওয়ার পরে এই দেশে হিন্দুসমাজের ভেতর থেকে যে একটি মধ্যবিত্ত নেতৃশ্রেণী মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে তার মধ্যে মুসলমান সমাজের প্রতিনিধিত্ব প্রায় না থাকার কারণ হিসেবে শুধুমাত্র ব্রিটিশের 'ডিভাইড এ্যান্ড রুল

পলিসি' কিংবা মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতি ইংরেজের অন্ধবিদ্বেষকে ধরে নিলে মুসলিম সমাজের তুলনামূলকভাবে পেছনে পড়ে থাকার কারণসমূহের সঠিক ব্যাখ্যা করা হবে না।

৮

ঊনবিংশ শতাব্দীতে হিন্দু মধ্যবিত্তের উত্থান যুগে ইউরোপীয় ভাবধারা, জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং নানা আধুনিক সামাজিক, সাংস্কৃতিক চিন্তারাশি বঙ্গীয় হিন্দু সমাজের একাংশের মধ্যে যে তরঙ্গ তুলেছিল, তা মুসলমান সমাজকে স্পর্শও করতে পারেনি। আধুনিক যুগের দাবীর সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে যে সকল ধর্মীয় এবং সামাজিক আন্দোলন ও সাংস্কৃতিক মূল্যচেতনার নেতৃত্ব হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণী দান করেছিলেন, মুসলমান সমাজে তা একেবারে প্রসার লাভ করেনি। জগত এবং জীবনের যে সকল অত্যাবশ্যকীয় প্রশ্ন নবযুগের আলোকে তাঁরা ঝালিয়ে নিচ্ছিলেন, মুসলমান সমাজ তার কিছুই গ্রহণ করেনি। সে সময়ে স্যার সৈয়দ আহমদ, সৈয়দ আমীর আলী, নওয়ার আবদুল লতিফ প্রমুখ যে সকল মুসলিম চিন্তানায়ক মুসলমানদের হয়ে কথা বলছিলেন এবং চিন্তা করছিলেন, মুসলমান সমাজের প্রকৃত দাবী কি হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে যথার্থ বোধ তাঁদেরও ছিল না। তাঁরাও নীচুতলার মুসলমান অর্থাৎ বাঙালী মুসলমান সম্বন্ধে চিন্তা করার কোনো অবকাশই পাননি। শিক্ষা-সংস্কৃতি এবং সংস্কার বলতে তাঁদের মনে প্রভুত্ব হারান উঁচু কোটির মুসলমানদের কথাই জাগরুক ছিল।

স্থানীয় মুসলমানদের মধ্যে বাংলা ভাষাকে আশ্রয় করে যে অধিকারচেতনা অপেক্ষাকৃত পরে জাগ্রত হয়, আসলে তা ছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর হিন্দু মধ্যবিত্তের আন্দোলন ও অগ্রগতির সম্প্রসারণ মাত্র। তাঁদেরকে তা করতে গিয়ে দু'ধরনের বাধার সম্মুখীন হতে হয়। লেখাপড়া, শিক্ষা-সংস্কৃতি, অর্থ-স্বার্থের দিক দিয়ে অনেকদূর অগ্রসর হিন্দু সমাজের সঙ্গে তাঁদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হত এবং অন্যদিকে উঁচু তলার মুসলমানদের মূল্যচেতনা এবং জীবনদৃষ্টিকে স্বীকার করে নেয়া ছাড়া তাঁদের গত্যন্তর ছিল না। এ দু-মুখী প্রতিবন্ধকতাকে অগ্রাহ্য করতে হলে যে শক্ত সামাজিক ভিত্তিভূমির প্রয়োজন ছিল, তাঁদের পেছনে তা ছিল না। তাই বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে থেকেও ইংরেজি শিক্ষা-দীক্ষার সুযোগ নিয়ে যাঁরা ওপরে উঠে আসতেন, উঁচুতলার মুসলমানদের জীবনদৃষ্টির সঙ্গে তাঁরা নিজেদের সংযুক্ত করতেন। স্যার সৈয়দ আহমদের আলীগড় আন্দোলন থেকে শুরু করে জামালুদ্দীন আফগানীর 'প্যান ইসলামিজম' পর্যন্ত পশ্চিম দিক থেকে আসা সমস্ত আন্দোলন-প্রবর্তনার সঙ্গে নিজেদের অংশীদার করে নিতেন। কিন্তু স্যার সৈয়দের আলীগড় আন্দোলন একান্তভাবে উত্তর প্রদেশের মুসলমানদের সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলমান সামন্তশ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যেই করা হয়েছিল। আবার এই সামন্তশ্রেণীর সঙ্গে জনগণের শ্রেণীগত তফাত ছাড়া ভাষা-সংস্কৃতিগত পার্থক্য যে ছিল

না একথা বিংশ শতাব্দীতেও ইংরেজী-শিক্ষিত মুসলমানেরা খুব কমই উপলব্ধি করতে পেরেছেন। তাঁরা বাঙালী মুসলমানের মধ্যে অনুরূপ সমাজচেতনা এবং মূল্যবোধ সঞ্চারের চেষ্টা করতেন। কিন্তু তা বাঙালী জনগণের সঙ্গে এতটা সম্পর্ক বিরহিত ছিল যে ভাবাদর্শিক কোনো জাগরণ আনতেই পারেনি। ধর্মীয় বদ্ধমত এবং সংস্কারকে আঘাত করে এমন কোনো সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক আন্দোলন মুসলমান সমাজের ভেতর থেকে জেগে উঠতে পারেনি। মুসলমানদের দ্বারা সংগঠিত প্রায় সমস্ত সামাজিক কর্মকাণ্ড এই ধর্মীয় পুনর্জাগরণভিত্তিক।

হিন্দু সমাজে যে ধর্মীয় পুনর্জাগরণমূলক আন্দোলন হয়নি একথা বলা আমাদের উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু তাঁদের একাংশের মধ্যে অন্তত কিছুসংখ্যক মানুষ মৌলিক চিন্তা করেছিলেন, এবং সামাজিক অনেকগুলো বদ্ধমতকে শাণিত আক্রমণ করেছিলেন; বাস্তবে না হলেও তত্ত্বগত দিক দিয়ে বেশ কিছুদূর যুক্তিবাদিতার চর্চা তাঁদের মধ্যে হয়েছে। তাঁদের কৃত আন্দোলনসমূহ যে সমুদ্র তরঙ্গের শীর্ষে ফসফরাসের মতো জ্বলেছে, সমাজে গভীরে প্রবিষ্ট হতে পারেনি, তার নিশ্চয়ই কারণ রয়েছে। কিন্তু মুসলমান সমাজের যুক্তিবাদিতার চাষ একেবারে হয়নি। মৌলিক চিন্তা-ভাবনা করেছেন, এমন মানুষ মুসলমান সমাজে খুব বেশি জন্মাতে পারেনি। নতুন যুগের আলোকে জগত এবং জীবনকে ব্যাখ্যা করে সমাজের সামনে তুলে ধরেছেন এমন মানুষ সত্যিই বিরল। মুসলমান সমাজে যে কোনো মনীষী জন্মাতে পারেননি তার কারণ সামাজিক লক্ষ্যের দ্বি কিংবা ত্রি-মুখীনতা। সামাজিক এবং ধর্মীয় সংগঠনসমূহের মধ্যেই বিভিন্নমুখী লক্ষ্যের কারণসমূহ সংগুপ্ত ছিল।

৯

বাঙালী মুসলমান বলতে যাঁদের বোঝায় তাঁরা মাত্র দুটি আন্দোলনে সাড়া দিয়েছিলেন এবং অংশগ্রহণ করেছিলেন। তার একটি তিতুমীরের অনুসারীদের দ্বারা পরিচালিত ওহাবী আন্দোলন। অন্যটি হাজী দুদু মিয়ার ফরায়েজী আন্দোলন। এই দুটি আন্দোলনেই বাঙালী মুসলমানেরা মনেপ্রাণে অংশগ্রহণ করেছেন। কিন্তু উঁচু শ্রেণীর মুসলমানেরা এই আন্দোলন সমর্থন করেছেন তার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। আসলেও কৃষক জনগণই ছিলেন এই আন্দোলন দুটির হোতা। আধুনিক কোনো রাষ্ট্র কিংবা সমাজদর্শন এই আন্দোলন দুটিকে চালনা করেনি। ধর্মই ছিল একমাত্র চালিকা শক্তি। সে সময়ে বাঙলা দেশে আধুনিক রাষ্ট্র এবং সমাজ সম্পর্কিত বোধের উন্মেষ ঘটেনি বললেই চলে। সমাজের নীচুতলার কৃষক জনগণকে সংগঠিত করার জন্য ধর্মই ছিল একমাত্র কার্যকর শক্তি। রাজনৈতিক দিক দিয়ে এই আন্দোলন দুটির ভূমিকা প্রগতিশীল ছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু সামাজিক দিক দিয়ে পশ্চাদগামী ছিল, তাতেও কোনো সন্দেহ নেই।

এই আন্দোলন দুটি ছাড়া, অন্য প্রায় সমস্ত আন্দোলন হয়তো ওপর থেকে চাপিয়ে দেয়া হয়েছে, কিংবা হিন্দু সমাজের উদ্যোগ এবং কর্মপ্রয়াসের সম্প্রসারণ হিসেবে মুসলমান সমাজে ব্যাপ্তিলাভ করেছে। সমাজের মৌল ধারাটিকে কোনো কিছুই প্রভাবিত করেনি। তার ফলে প্রাগৈতিহাসিক যুগের আদিম কৃষিভিত্তিক কৌমসমাজের মনটিতে একটু রংটং লাগলেও কোনো রূপান্তর বা পরিবর্তন হয়নি। মধ্যিখানে কয়েকটি শতাব্দীর পরিবর্তন কোনো ভাবান্তর আনতে পারেনি। বিংশ শতাব্দীতেও এই মনের বিশেষ হেরফের ঘটেনি। বাঙালী মুসলমানের রচিত কাব্য-সাহিত্য-দর্শন-বিজ্ঞান পর্যালোচনা করলেই এ সত্যটি ধরা পড়বে। কোনো বিষয়েই তাঁরা উল্লেখ্য কোনো মৌলিক অবদান রাখতে পারেননি। সত্য বটে, কাজী নজরুল ইসলাম, জসীম উদ্‌দীন প্রমুখ কবি কাব্যের ক্ষেত্রে অসাধারণ সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন। একটু তলিয়ে দেখলেই ধরা পড়বে, উভয়েরই রচনায় চিন্তার চাইতে আবেগের অংশ অধিক। তাছাড়া এই দুই কবির প্রথম পৃষ্ঠপোষক ও গুণগ্রাহী ছিল হিন্দু সমাজ, মুসলমান সমাজ নয়।

মুসলমান সাহিত্যিকদের রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো হয়তো চর্বিতচর্বণ, নয়তো ধর্মীয় পুনর্জাগরণ। এর বাইরে চিন্তা, যুক্তি এবং মনীষার সাহায্যে সামাজিক ডগ্‌মা বা বদ্ধমতসমূহের অসারতা প্রমাণ করেছেন তেমন লেখক-কবি মুসলমান সমাজে আসেননি। বাঙালী মুসলমান সমাজ স্বাধীন চিন্তাকেই সবচেয়ে ভয় করে। তার মনের আদিম সংস্কারগুলো কাটেনি। সে কিছুই গ্রহণ করে না মনের গভীরে। ভাসাভাসা ভাবে অনেককিছুই জানার ভান করে আসলে তার জানাশোনোার পরিধি খুবই সঙ্কুচিত। বাঙালী মুসলমানের মন এখনো একেবারে অপরিণত, সবচেয়ে মজার কথা এ-কথাটা ভুলে থাকার জন্যই সে প্রাণান্তকর চেষ্টা করতে কসুর করে না। যেহেতু আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং প্রসারমান যান্ত্রিক কৃৎকৌশল স্বাভাবিকভাবে বিকাশলাভ করছে এবং তার একাংশ সুফলগুলোও ভোগ করছে, ফলে তার অবস্থা দাঁড়িয়ে যাচ্ছে এঁচড়েপাকা শিশুর মতো। অনেক কিছুরই সে সংবাদ জানে, কিন্তু কোনো কিছুকে চিন্তা দিয়ে, যুক্তি দিয়ে, মনীষা দিয়ে আপনার করতে জানে না। যখনই কোনো ব্যবস্থার মধ্যে কোনরকম অসংগতি দেখা দেয়, গোঁজামিল দিয়েই সবচেয়ে বেশি আনন্দ পায় এবং এই গোঁজামিল দিতে পারাটাকে রীতিমতো প্রতিভাবানের কর্ম বলে মনে করে। শিশুর মতো যা কিছু হাতের কাছে, চোখের সামনে আসে, তাই নিয়েই সে সন্তুষ্ট। দূরদর্শিতা তার একেবারেই নেই, কেননা একমাত্র চিন্তাশীল মনই আগামীকাল কি ঘটবে সে বিষয়ে চিন্তা করতে জানে। বাঙালী মুসলমান বিমূর্তভাবে চিন্তা করতেই জানে না এবং জানে না এই কথাটি ঢেকে রাখার যাবতীয় প্রয়াসকে তার কৃষ্টি-কালচার বলে পরিচিত করতে কুণ্ঠিত হয় না।

বাঙালী মুসলমানের সামাজিক সৃষ্টি, সাংস্কৃতিক সৃষ্টি, দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিক সৃষ্টিসমূহের প্রতি চোখ বুলোলেই তা প্রতিভাত হয়ে উঠবে। সাবালক মন থেকেই উন্নত স্তরের সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞানের উদ্ভব এবং বিকাশ সম্ভব। এই সকল ক্ষেত্রে তার

মনের সাবালকত্বের কোনো পরিচয় রাখতে পারেনি। যে জাতি উন্নত বিজ্ঞান, দর্শন এবং সংস্কৃতির স্রষ্টা হতে পারে না, অথবা সেগুলোকে উপযুক্ত মূল্য দিয়ে গ্রহণ করতে পারে না, তাকে দিয়ে উন্নত রাষ্ট্র সৃষ্টিও সম্ভব নয়। যে নিজের বিষয় নিজে চিন্তা করতে জানে না, নিজের ভালোমন্দ নিরূপণ করতে অক্ষম, অপরের পরামর্শ এবং শোনা কথায় যার সমস্ত কাজ-কারবার চলে, তাকে খোলা থেকে আগুনে কিংবা আগুন থেকে খোলায়, এইভাবে পর্যায়ক্রমে লাফ দিতেই হয়। সুবিধার কথা হলো নিজের পঙ্গুত্বের জন্য সব সময়েই দায়ী করবার মতো কাউকে না কাউকে পেয়ে যায়। কিন্তু নিজের আসল দুর্বলতার উৎসটির দিকে একবারও দৃষ্টিপাত করে না।

বাঙালী মুসলমানের মন যে এখনো আদিম অবস্থায়, তা বাঙালী হওয়ার জন্যও নয় এবং মুসলমান হওয়ার জন্যও নয়। সুদীর্ঘকালব্যাপী একটি ঐতিহাসিক পদ্ধতির দরুণ তার মনের ওপর একটি গাঢ় মায়াজাল বিস্তৃত হয়ে রয়েছে, সজ্ঞানে তার বাইরে সে আসতে পারে না। তাই এক পা যদি এগিয়ে আসে, তিন পা পিছিয়ে যেতে হয়। মানসিক ভীতিই এই সমাজকে চালিয়ে থাকে। দু'বছরে কিংবা চার বছরে হয়তো এ অবস্থার অবসান ঘটানো যাবে না, কিন্তু বাঙালী মুসলমানের মনের ধরণ-ধারণ এবং প্রবণতাগুলো নির্মোহভাবে জানার চেষ্টা করলে এ অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার একটা পথ হয়তো পাওয়াও যেতে পারে।

১৯৭৭

বাঙালী মুসলমানের মন
(১৯৮১ / ১৯৯৬)